প্রোফেসর শঙ্কু
ও কোচাবাম্বার গুহা

সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা

সত্যজিৎ রায়

৭ই আগস্ট

আজ আমার পুরনো বন্ধু হনলুলুর প্রোফেসর ডামবার্টনের একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন—

প্রিয় শ্যাঙ্কস,

খামের উপর ডাকটিকিট দেখেই বুঝতে পারবে যে বোলিভিয়া থেকে লিখছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও যে সভ্য সমাজের উপকার হতে পারে তার আশ্চর্য প্রমাণ এখানে এসে পেয়েছি। সেটার কথা তোমাকে জানানোর জন্যেই এই চিঠি।

গত জুন মাসে বোলিভিয়ায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার খবর তোমার গিরিডিতেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। এই ভূমিকম্পের ফলে এখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কোচাবাম্বা থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে একটা বিশাল পাহাড়ের বৃহত্তম একটা অংশ চিরে দু'ভাগ হয়ে একটা যাতায়াতের পথ তৈরি হয়ে যায়। এই পাহাড়ের পিছন দিকটায় এর আগে কোনও মানুষের পা পড়েনি (বোলিভিয়ার অনেক অংশই ভূতাত্ত্বিকদের কাছে এখনও অজানা তা তুমি জানো)। যাই হোক, এই পাহাড়ের কাছাকাছি একটা গ্রামের কিছু ছেলে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এই নতুন পথ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন পাহাড়ের গায়ে একটি গুহার মধ্যে লুকোনোর জন্য ঢোকে, এবং ঢুকেই তার ভিতরের দেয়ালে

আঁকা রঙিন ছবি দেখতে পায়।

আমি গত শনিবার পেরুতে একটা কনফারেন্সে যাবার পথে বোলিভিয়ায় আসি ভূমিকম্পের কীর্তি চাক্ষুষ দেখার জন্য। আসার পরদিনই স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক প্রোফেসর কর্ডোবার কাছে গুহার খবরটা শুনি, এবং সেইদিনই গিয়ে ছবিগুলো দেখে আসি। আমার মনে হয় তোমারও একবার এখানে আসা দরকার। ছবিগুলো দেখবার মতো। কর্ডোবার সঙ্গে আমার মতভেদ হচ্ছে। তোমার সমর্থন পেলে (নিশ্চয়ই পাব!) মনে কিছুটা জোর পাব। চলে এসো। পেরুতে বলে দিয়েছি—তোমার নামে কনফারেন্সের একটা আমন্ত্রণ যাচ্ছে। তারাই তোমার যাতায়াতের খরচ দেবে।

আশা করি ভালো আছ। ইতি—

হিউগো ডামবার্টন

আমার যাওয়ার লোভ হচ্ছে দুটো কারণে। প্রথমত, দক্ষিণ আমেরিকার এ অঞ্চলটা আমার দেখা হয়নি। দ্বিতীয়ত, স্পেনের বিখ্যাত আলতামিরা গুহার ছবি দেখার পর থেকেই আদিম মানুষ সম্পর্কে আমার মনে নানা রকম প্রশ্ন জেগেছে। পঞ্চাশ হাজার বছর আগের মানুষ—যাদের সঙ্গে বাঁদরের তফাত খুব সামান্যই—তাদের হাত দিয়ে এমন ছবি বেরোয় কী করে তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এক একটা ছবি দেখে মনে হয়, আজকের দিনের আর্টিস্টও এত ভালো আঁকিতে পারে না; অথচ এরা নাকি ভালো করে সোজা হয়ে হাঁটতেও পারত না!

নেহাতই যদি বোলিভিয়া যাওয়া হয়, তা হলে সঙ্গে আমার নতুন তৈরি ‘অ্যানিস্থিয়াম’ পিস্তলটা নেব, কারণ যে জায়গায় এর আগে মানুষের

পা পড়েনি সেখানে নানা রকম অজানা বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। অ্যানিস্থিয়াম পিস্তলের ঘোড়া টিপলে তার থেকে একটা তরল গ্যাস তীরের মতো বেরিয়ে শত্রুর গায়ে লেগে তাকে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান করে দিতে পারে।

এখন অপেক্ষা শুধু পেরুর নেমন্তন্নের জন্য।

১৮ই আগস্ট

বোলিভিয়ার কোচাবাম্বা শহর থেকে একশো ত্রিশ মাইল দূরে ভূমিকম্পের ফলে আবিষ্কৃত গুহার বাইরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। হাত দশেক দূরে মাটিতে প্রায় সমতল পাথরের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে ডামবার্টন, তার হাত দুটো ভাঁজ করে মাথার নিচে রাখা, তার সাদা কাপড়ের টুপিটা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুখের উপর ফেলা।

এখন বিকেল চারটে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আর মিনিট কুড়ির মধ্যে সূর্য নেমে যাবে পাহাড়ের পিছনে। এ জায়গাটাকে ঘিরে একটা অস্বাভাবিক, আদিম নিস্তব্ধতা। মানুষের পা যে এর আগে এদিকে পড়েনি, সেটা আশ্চর্যভাবে অনুভব করা যায়। মানুষ বলতে যে আমি সভ্য

মানুষ বলছি সেটা বলাই বাহুল্য, কারণ আদিম মানুষ যে এককালে এখানে ছিল তার প্রমাণ আমাদের পাশের গুহাতেই রয়েছে। বোলিভিয়ার ভূমিকম্পের দৌলতে ক্রমে পৃথিবীর লোকে এই আশ্চর্য গুহার কথা জানতে পারবে। আলতামিরার গুহা আমি নিজে দেখেছি; ফ্রান্সের লাস্কো গুহার ছবি বইয়ে দেখেছি। কিন্তু বোলিভিয়ার এ গুহার সঙ্গে ও দুটোর কোনও তুলনাই হয় না।

প্রথমত, ছবি সংখ্যায় অনেক বেশি। গুহার ভিতরে ঢুকলেই এক মেঝেতে ছাড়া আর সর্বত্র ছবি চোখে পড়ে। গুহার মুখ থেকে প্রায় একশো গজ ভিতরে পর্যন্ত ছবি রয়েছে। তারপর থেকে গুহাটা হঠাৎ সরু হয়ে গিয়েছে—হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয়। সেইভাবে বেশ খানিকটা পথ এগিয়েও আমরা আর কোনও ছবি দেখতে পাইনি। মনে হয় ছবির শেষ ওই একশো গজেই। কিন্তু গুহাটা যেহেতু চওড়ায় বেশ অনেকখানি, এই একশো গজের মধ্যেই ছবির সংখ্যা হবে আলতামিরার প্রায় দশগুণ।

এ ছবিতে আঁকার গুণ ছাড়াও আরও অনেক অবাক করা ব্যাপার আছে। আদিম মানুষ গুহার দেয়ালে সাধারণত শিকারের ছবিই আঁকত। জন্তুজানোয়ার যা আঁকত তা সবই তাদের শিকারের জিনিস। তা ছাড়া, মানুষ বল্লম দিয়ে জানোয়ার মারছে, এমন ছবিও দেখা যায়। এখানেও শিকারের ছবি আছে, কিন্তু সে ছাড়াও এমন ছবি আছে যার সঙ্গে শিকারের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না; যেমন, গাছপালা ফুল পাখি পাহাড় চাঁদ ইত্যাদি। বোঝাই যায় এসব জিনিস ভালো লেগেছে বলে আঁকা হয়েছে। আর কোনও কারণ নেই। ছবির ফাঁকে ফাঁকে এক ধরনের হিজিবিজি নকশা বা অক্ষরের মতো জিনিস লক্ষ করলাম যার

কোনও মানে করা যায় না। সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে, এরা বেশ একটা বিশেষ ধরনের আদিম মানুষ ছিল।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এইসব ছবির রং। এই রঙের এত বাহার আর এত জৌলুস যা নাকি অন্য কোনও প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছবিতে নেই। বোধ হয় এরা কোনও বিশেষ ধরনের পাকা রং ব্যবহার করত। মোট কথা ছবিগুলোকে হঠাৎ দেখলে দশ-বারো বছরের বেশি পুরনো নয় বলেই মনে হয়। অথচ স্বভাবতই ছবির জানোয়ারগুলো ফ্রান্স বা স্পেনের মতোই সবই প্রাগৈতিহাসিক। আদিম বাইসন, বিরাট বাঁকানো দাঁতওয়ালা বাঘ—এই সব কিছুরই অজস্র অদ্ভুত ছবি এই গুহাতে আছে। এছাড়া আরেক রকম জানোয়ারের ছবি লক্ষ করলাম যেটা আমাদের দুজনের কাছেই একেবারে নতুন বলে মনে হলো। এর গলাটা লম্বা, নাকের উপর গণ্ডারের মতো শিং, আর সারা পিঠময় শজারুর মতো কাঁটা। একটা মোটা ল্যাজও আছে, বোধ হয় কুমিরের ল্যাজের মতো। সব মিলিয়ে ভারী উদ্ভট চেহারা।

আমি আজ সারাদিন আমার 'ক্যামের‍্যাপিড' দিয়ে গুহার ছবির ছবি তুলেছি। এই ক্যামেরা আমারই তৈরি। এতে রঙিন ছবি তোলা যায়, আর তোলার পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। হোটেলে ফিরে গিয়ে ছবিগুলো নিয়ে বসব।

গুহার বাইরে এসে চারিদিকে চাইলে বেশ বোঝা যায় কেন এদিকটায় মানুষ এতদিন আসতে পারেনি। এ জায়গাটার তিনদিক ঘিরে খাড়াই স্লেটপাথরের পাহাড়। এই পাহাড়ের গা অস্বাভাবিক রকম মসৃণ, ঝোপঝাড় গাছপালা নেই বললেই চলে। অন্য দিকে—অর্থাৎ উত্তর দিকে

—দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় আধ মাইল তো হবেই। জঙ্গলের পিছনে দূরে অ্যান্ডিজ পর্বতশ্রেণী দেখা যায়, তার মাথায় বরফ। গুহার আশেপাশে গাছপালা বিশেষ নেই, তবে বড় বড় পাথরের চাঁই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার এক একটা পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু। পোকামাকড়ের অভাব নেই এখানে, তবে পাখি জিনিসটা এখনও চোখে পড়েনি; হয়তো জঙ্গলের ভিতরে আছে। একটু আগে একটা ফুট চারেক লম্বা আরমাডিলো বা পিঁপড়েখোর জানোয়ার ডামবার্টনের খুব কাছ দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটা পাথরের টিপির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সব কিছু মিলিয়ে এখানকার পরিবেশটা একেবারে আদিম, আর তাই গুহার ছবিগুলোর বাহার এত অবাক করে দেয়।

একটা কথা বলে রাখা ভালো—এখানকার বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর পোরফিরিও কর্ডোবা আমাদের এই গুহা অভিযানের ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখছেন না। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের গভীর মতভেদ হচ্ছে। কর্ডোবা বললেন—

"তোমরা এই গুহাটাকে প্রাগৈতিহাসিক বলছ কী করে জানি না। আমার মনে হয় এর বয়স খুব বেশি হলে হাজার বছর। পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো গুহার ছবির রং এত উজ্জ্বল হবে কী করে?"

কর্ডোবার কথা বলার ঢং বেশ রুক্ষ—অনেকটা তার চেহারার মতোই। এত ঘন ভুরু কোনও লোকের আমি দেখিনি।

আমি বললাম, "দেয়ালে যে সব প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি রয়েছে, সেগুলো কী করে এলো?"

কর্ডোবা হেসে বললেন, “মানুষের কল্পনায় আজকের দিনেও হাতির গায়ে লোম গজাতে পারে। ওতে কিস্যু প্রমাণ হয় না। আমাদের দেশের ইনকা সভ্যতার কথা শুনেছ তো? ইনকাদের আঁকা ছবির কোনও জানোয়ারের সঙ্গে আসল জানোয়ারের হুবহু মিল নেই। তা হলে কি সে সব জানোয়ারকে প্রাগৈতিহাসিক বলতে হবে? ইনকা সভ্যতার বয়স হাজার বছরের বেশি নয় মোটেই।”

আমি কিছু না বললেও, ডামবার্টন একথার উত্তর দিতে কসুর করল না। সে বলল, ‘প্রোফেসর কর্ডোবা, আলতামিরার গুহা যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখনও সেটাকে অনেক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাগৈতিহাসিক বলে মানতে চাননি। পরে কিন্তু তাঁদের ভারী অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল!”

এর উত্তরে কর্ডোবা কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি যে আমাদের এই অভিযানে মোটেই সন্তুষ্ট নন সেকথা আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি।

যাই হোক, আমরা কর্ডোবাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চালিয়ে যাব। আজকের কাজ এখানেই শেষ। এবার শহরে ফেরা উচিত।

১৮ই আগস্ট, রাত বারোটা

গুহা থেকে শহরের হোটেলে ফিরেছি রাত সাড়ে নটায়। ডিনার খেয়ে ঘরে এসে গত দুঘণ্টা ধরে আমার আজকের তোলা ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখেছি। প্রাকৃতিক জিনিসের ছবির চেয়েও যেগুলো সম্পর্কে বেশি কৌতূহল হচ্ছে সে হলো ওই হিজিবিজিগুলো নিয়ে। অনেকগুলো হিজিবিজির ছবি পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল লক্ষ করেছি। এমনকী এ সন্দেহও মনে জাগে যে, হয়তো এগুলো আসলে অক্ষর বা সংখ্যা। তাই যদি হয়, তা হলে তো এদের শিক্ষিত অসভ্য বলতে হয়! অবিশ্যি এটা অনুমান মাত্র; আসলে হয়তো এগুলো এইসব আদিম মানুষের কুসংস্কার সংক্রান্ত কোনও সাংকেতিক চিহ্ন।

এ নিয়ে কাল ডামবার্টনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

১৯শে আগস্ট, রাত এগারোটা

হোটেলের ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। আজ বোধ হয় এদের পরব-টরব আছে, কারণ কোত্থেকে যেন গানবাজনা আর হইহল্লার শব্দ ভেসে আসছে। মিনিট পাঁচেক আগে একটা মৃদু ভূমিকম্প হয়ে গেল। একটা বড় ভূমিকম্পের পর কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝে অল্প ঝাঁকুনির ব্যাপারটা

অস্বাভাবিক নয়।

আজকের রোমাঞ্চকর ঘটনার পর বেশ ক্লান্ত বোধ করছি; কিন্তু তাও এইবেলা ব্যাপারটা লিখে ফেলা ভালো। আগেই বলে রাখি—রহস্য আরও দশগুণ বেড়ে গেছে। আর তার সঙ্গে একটা আতঙ্কের কারণ দেখা দিয়েছে, যেটা ডামবার্টনের মতো জাঁদরেল আমেরিকানকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

আগেই বলেছি, কোচাবাম্বা থেকে গুহাটা প্রায় একশো ত্রিশ মাইল দূরে। রাস্তা ভালো থাকলে এ পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব হত। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে রাস্তা অনেক জায়গায় বেশ খারাপ হয়ে আছে, ফলে চার ঘণ্টার কমে জিপে যাওয়া যায় না। ফাটলের মুখে এসে জিপ থেকে নেমে বাকি পথটা (দশ মিনিটের মতো) পাথর ডিঙিয়ে হেঁটে যেতে হয়।

এই কারণে আমরা ঠিক করেছিলাম যে ভোর ছ'টার মধ্যে আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।

হোটেল থেকে যখন জিপ রওনা দিল, তখন ঠিক সোয়া ছটা। সূর্য তখনও পাহাড়ের পিছনে। আজ সঙ্গে আমরা একটি স্থানীয় স্প্যানিশ লোককে নিয়েছিলাম—নাম পেদ্রো। উদ্দেশ্য ছিল আমরা যখন গুহার ভিতরে ঢুকব, তখন সে বাইরে থেকে পাহারা দেবে। কারণ কিছু জিনিসপত্র খাবারদাবার ইত্যাদি বাইরে রাখলে আমাদের চলাফেরা আরও সহজ হতে পারবে। আমরা কিছু না বলাতেও দেখলাম পেদ্রো তার সঙ্গে একটি বন্দুক নিয়ে এগোচ্ছে। কেন জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, “সিনিওর, এখানকার জঙ্গল থেকে কখন যে কী বেরোয় তা বলা যায়

না। তাই এটা আমার আত্মরক্ষার জন্যই এনেছি।”

ত্রিশ মাইল গাড়ি যাবার পর হঠাৎ খেয়াল হলো যে, আমাদের পিছন পিছন আরেকটা গাড়ি আসছে, এবং সেটা যেন আমাদের গাড়িটার নাগাল পাবার জন্য বেশ জোরেই এগিয়ে আসছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাড়িটা (সেটাও একটা জিপ) আমাদের পাশে এসে পড়ল। গাড়ির মধ্যে থেকে দেখি প্রোফেসর কর্ডোবা হাত বাড়িয়ে আমাদের থামতে বলছেন।

অগত্যা থামলাম, এবং দুজনেই গাড়ি থেকে রাস্তায় নামলাম। অন্য জিপটা থেকে কর্ডোবা নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তার মধ্যে একটা স্পষ্ট উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম।

কর্ডোবা আমাদের দুজনকে গম্ভীরভাবে নমস্কার জানিয়ে বলল, “আমার ড্রাইভার তোমার ড্রাইভারকে জানে। তার কাছ থেকেই জানলাম তোমরা ভোরে ভোরে বেরিয়ে পড়বে। আমি এসেছি তোমাদের সাবধান করে দিতে।”

আমরা দুজনেই অবাক। বললাম, “কী ব্যাপারে সাবধান হতে বলছ?”

কর্ডোবা বলল, “গুহার উত্তর দিকের জঙ্গলটা খুব নিরাপদ নয়।”

ডামবার্টন বলল, “কী করে জানলে?”

কর্ডোবা বলল, “আমি প্রথম যেদিন গুহাটা দেখতে যাই, সেদিন জঙ্গলটাতেও ঢুকেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে, ছবিগুলো খুব অল্প কদিন আগে আঁকা, এবং জঙ্গলের মধ্যেই বোধ হয় ছবির রঙের উপাদানগুলো পাওয়া যাবে। হয়তো কোনও বিশেষ গাছের রস থেকে বা

কোনওরকম পাথর জলে ঘষে রংগুলো তৈরি হয়েছে।”

“তার কোনও হদিস পেয়েছিলে কি?”

“না। কারণ, বেশি ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি। জঙ্গলের মাটিতে কিছু পায়ের ছাপ দেখে ভয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।”

“কী রকম পায়ের ছাপ?”

“অতিকায় জানোয়ারের। কোনও জানা জন্তুর পায়ের ছাপ ওরকম হয় না।”

ডামবার্টন হেসে বলল, “ঠিক আছে। আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের সঙ্গে অস্ত্রধারী লোক আছে। তা ছাড়া গুহায় আমাদের যেতেই হবে। এমন সুযোগ আমরা ছাড়তে পারব না। কী বলো শ্যাঙ্কস?”

আমি মাথা নেড়ে ডামবার্টনের কথায় সায় দিয়ে বললাম, “সাধারণ অস্ত্র ছাড়াও অন্য অস্ত্র আছে আমাদের কাছে। একটা আস্ত ম্যামথকে তা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শায়েস্তা করতে পারবে।”

কর্ডোবা বলল, “বেশ। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম, কারণ দেশটা আমারই, তোমরা এখানে অতিথি। তোমাদের কোনও অনিষ্ট হলে আমার উপরে তার খানিকটা দায়িত্ব এসে পড়তে পারে তো! তবে তোমরা নেহাতই যখন আমার নিষেধ মানবে না, তখন আর আমি কী করতে পারি বলো? আমি আসি। তোমরা বরং এগোও!”

কর্ডোবা তাঁর জিপে উঠে উল্টোমুখো শহরের দিকে চলে গেলেন, আর আমরাও আবার রওনা দিলাম গুহার দিকে।

কিছুদূর যাবার পর সামনের সিট থেকে পেদ্রো হঠাৎ আমাদের দিকে

মুখ ঘুরিয়ে বলল, “ভূমিকম্পের দিন প্রোফেসর কর্ডোবার কী হয়েছিল আপনারা শুনেছেন কি?”

বললাম, “কই, না তো। কী হয়েছিল?”

পেড্রো বলল, “সেদিন ছিল রবিবার। প্রোফেসর সকালে উঠে গির্জায় যাচ্ছিলেন। গির্জার গেট দিয়ে ঢুকবার সময় ভূমিকম্পটা শুরু হয়। প্রোফেসরের চোখের সামনে সান্তা মারিয়া গির্জা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, আর প্রায় ৩০০ লোক পাথর চাপা পড়ে মারা যায়। আর দশ সেকেন্ড পরে হলে প্রোফেসরেরও ওই দশা হত।”

আমরা বললাম, “সে তো ওর খুব ভাগ্য ভালো বলতে হবে।”

পেড্রো বলল, “তা ঠিক, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে প্রোফেসরের মাথা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। আজ যে জন্তুর কথা বলছিলেন, মনে হয় সেটা একেবারে মনগড়া। ও জঙ্গলে যা জন্তু আছে, তা বোলিভিয়ার সব জঙ্গলেই আছে।”

আমি আর ডামবার্টন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। দুজনেরই মনে এক ধারণা : কর্ডোবা চান না যে আমরা গুহায় গিয়ে কাজ করি। অর্থাৎ খুব সম্ভবত তিনি চাইছেন যে গুহায় যদি কোনও আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কার করার থাকে, তা হলে সেটা উনিই করেন; আমরা বাইরের লোক এসে তাঁর এলাকায় মাতব্বরি করে যেন বৈজ্ঞানিক জগতের বাহবাটা না নিই। বৈজ্ঞানিকদের পরস্পরের মধ্যে এই রেশারেশির ভাবটা যে অস্বাভাবিক না সেটা আমি জানি। তবু বলব যে সুদূর বোলিভিয়ায় এসে এ জিনিসটার সামনে পড়তে হবে সেটা আশা করিনি।

*** *** ***

পেদ্রোকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যখন আমরা গুহার ভিতরে ঢুকলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা। আজ সূর্য কিছুটা ম্লান, কারণ আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা। গতকাল গুহার ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত বাইরের সূর্যের প্রতিফলিত আলোতেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল; আজ পঞ্চাশ পা এগোতে না এগোতেই হাতের টর্চ জ্বালতে হলো।

পথ যেখানে সরু হয়ে এসেছে, সেখান থেকে যথারীতি হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম। আজ আরও কিছু বেশি দূর যাব। এখানে ছবি নেই, তাই আশেপাশে দেখবারও কিছু নেই। আমরা মাটির দিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম। পাথর আশ্চর্য রকম মসৃণ, আর আলগা পাথর নেই বললেই চলে। বেশ বোঝা যায় যে এখানে আদিম মানুষেরা অনেক দিন ধরে বসবাস করেছিল, আর তাদের যাতায়াতের ফলেই পাথরের এই মসৃণতা।

গতকাল যে পর্যন্ত এসেছিলাম, তার থেকে শ'খানেক হাত এগিয়ে দেখলাম সুড়ঙ্গ আবার চওড়া হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আর কোনও ছবির চিহ্ন নেই। ডামবার্টন বলল, "জানো শ্যাঙ্কস—এক একবার মনে হচ্ছে যে আর এগিয়ে লাভ নেই। কিন্তু গুহার এই যে অস্বাভাবিক পরিষ্কার ভাব, এতেই যেন মনে হয় ভিতরে আরও দেখবার জিনিস আছে।"

ডামবার্টন আমার মনের কথাটাই যেন প্রকাশ করল। সত্যি, কী আশ্চর্য ঝকঝকে তকতকে এই গুহার ভিতরটা। দেয়ালের দিকে চাইলে মনে হয় যেন এখানে নিয়মিত ডাস্টার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

সুড়ঙ্গ চওড়া হয়ে যাওয়াতে আমরা সোজা হয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময় আমার কানে একটা শব্দ এলো। ডামবার্টনের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে থামতে বললাম।

"শুনতে পাচ্ছ?"

খুট খুট খুট খুট খুট খুট... আমার কানে শব্দটা স্পষ্ট—কিন্তু ডামবার্টনের শ্রবণশক্তি বোধ হয় আমার মতো তীক্ষ্ণ নয়। সে আরও কিছু এগিয়ে গেল। তারপর থেমে ফিসফিস করে বলল, "পেয়েছি।"

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনলাম। মাঝে মাঝে থামছে, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়।

মানুষ? না অন্য কিছু? বললাম, "এগিয়ে চলো।"

ডামবার্টন বলল, "তোমার পিস্তল সঙ্গে আছে?"

"আছে।"

"ওটা কাজ করে তো?"

হেসে বললাম, "তোমার ওপর তো আর পরীক্ষা করে দেখতে পারি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমার তৈরি কোনও জিনিস আজ পর্যন্ত 'ফেল' করেনি।"

"তবে চলো।"

আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা মোড় ঘুরেই দুজনে একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমরা একটা রীতিমতো বড় হলঘরের মধ্যে এসে পড়েছি। এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারলাম সেটা একটা গোল ঘর, যার ডায়ামিটার হবে কমপক্ষে একশো ফুট, আর যেটা উঁচুতে অন্তত কুড়ি

ফুট।

হলঘরের দেওয়াল ও ছাত ছবি ও নকশাতে গিজগিজ করছে। ছবির চেয়ে নকশাই বেশি, আর তাদের চেহারা দেখে বুঝতে কোনওই অসুবিধে হলো না যে সেগুলো অঙ্ক বা ফরমুলা জাতীয় কিছু।

ডামবার্টন চাপা গলায় বলল, "শিল্পের জগৎ থেকে ক্রমে যে বিজ্ঞানের জগতে এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে! এ কাদের কীর্তি? এসবের মানে কী? কবেকার করা এসব নকশা?"

খুট খুট শব্দটা থেমে গেছে। আমি হাত থেকে টর্চটা নামিয়ে রেখে কাঁধের থলি থেকে ক্যামেরা বার করলাম। ফ্ল্যাশলাইট আছে—কোনও চিন্তা নেই। বেশ বুঝতে পারলাম উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে।

ক্যামেরা বার করে সবেমাত্র দুটো ছবি তুলেছি, এমন সময় একটা ক্ষীণ অথচ তীব্র চিৎকার আমাদের কানো এলো।

আওয়াজটা নিঃসন্দেহে আসছে গুহার বাইরে থেকে। পেদ্রোর চিৎকার।

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে আমরা দুজনেই উল্টোদিকে রওনা দিলাম। হেঁটে, দৌড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে পৌঁছোতে লাগল প্রায় কুড়ি মিনিট।

বেরিয়ে এসে দেখি পেদ্রো তার জায়গায় নেই, যদিও আমাদের জিনিসপত্রগুলো ঠিকই রয়েছে। কোথায় গেল লোকটা? ডাইনে একটা পাথরের টিপি। ডামবার্টন দৌড়ে তার পিছন দিকটায় গিয়েই একটা চিৎকার দিল—

"কাম হিয়ার, শ্যাঙ্কস!"

গিয়ে দেখি পেদ্রো চিত হয়ে চোখ কপালে তুলে পড়ে আছে, তার গলায় একটা গভীর ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর তার বন্দুকটা পড়ে আছে তার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে, মাটিতে। পেদ্রোর নিষ্পলক চোখে আতঙ্কের ভাব আমি কোনও দিন ভুলব না। ডামবার্টন তার নাড়ি ধরে বলল, "হি ইজ ডেড।"

এটা বলবারও দরকার ছিল না। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে পেদ্রোর দেহে প্রাণ নেই।

পেদ্রোর দিক থেকে এবার দৃষ্টি গেল আরও প্রায় বিশ হাত উত্তর দিকে। মাটিতে খানিকটা জায়গা জুড়ে আরেকটা লালের ছোপ। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম সেটাও হয়তো রক্ত, কিন্তু মানুষের নয়। রক্তের কাছাকাছি যে জিনিসটা পড়ে আছে সেটাকে দেখলে হঠাৎ একটা হাতল-ছাড়া তলোয়ার মনে হয়। হাতে তুলে নিয়ে দেখি সেটা ধাতুর তৈরি কোনও জিনিস নয়।

ডামবার্টনের হাতে দেওয়াতে সে নেড়ে চেড়ে বলল, "এ থেকে যা অনুমান করছি সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়।"

আমি বুঝলাম যে আমাদের দুজনেরই অনুমান এক, কিন্তু তাও সেটা সত্যি হতে পারে বলে বিশ্বাস করছিলাম না। বললাম, "দেওয়ালে আঁকা সেই নাম-না-জানা জানোয়ারের কথা ভাবছ কি?"

"এগজ্যাক্টলি। পেদ্রো জখম হয়েও গুলি চালিয়েছিল। তার ফলে জানোয়ারটাও জখম হয়, এবং তার পিঠ থেকে এই কাঁটাটি খসে পড়ে।"

ডামবার্টনের বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও সে রীতিমতো জোয়ান। সে

একাই পেদ্রোর মৃতদেহ কাঁধে করে তুলে নিল। আমি বাকি জিনিসপত্র নিলাম।

আকাশে মেঘ করে একটা থমথমে ভাব।

কর্ডোবা তা হলে হয়তো মিথ্যে বলেনি। উত্তরের এই জঙ্গলের মধ্যে আরও কত অজানা বিভীষিকা লুকিয়ে রয়েছে কে জানে?

পেদ্রোর মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, তার বৃদ্ধ বাবাকে সান্ত্বনা ও কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হোটেলে যখন ফিরছি তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে তখন বেজেছে সাতটা।

হোটেলে ঢুকে দেখি সামনেই একটা সোফায় বসে রয়েছেন প্রোফেসর কর্ডোবা। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক বেশ ব্যস্তভাবে উঠে এগিয়ে এলেন।

"যাক, তোমরা তা হলে ফিরেছ!"

ডামবার্টন বলল, "ফিরেছি, তবে সকলে না।"

"তার মানে?"

কর্ডোবাকে ঘটনাটা বললাম।

সব শুনেটুনে কর্ডোবার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাব জেগে উঠল যার মধ্যে আক্ষেপের চেয়ে উল্লাসের মাত্রা অনেক বেশি। চাপা উত্তেজনার সঙ্গে সে বলল, "আমার কথা বোধ হয় তোমরা বিশ্বাস করনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছ তো? আমি জানি ও জঙ্গলে সব অদ্ভুত জানোয়ার রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আর আমি জানি গুহার ছবি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ভুল। ওখানে ইনকা জাতীয় কোনও

সভ্য লোক বাস করত, আর সেও খুব বেশি দিন আগে নয়। ছবির জানোয়ারগুলো দেখেই তো তোমরা গুহার বয়স অনুমান করছিলে? কিন্তু এখন বুঝতেই পারছি, ওর মধ্যে অন্তত এক ধরনের জানোয়ার এখনও আছে, লোপ পেয়ে যায়নি। কাজেই আমার অনুমান ঠিক। তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি, এ গুহায় তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।"

কর্ডোবা কথাগুলো বলে হন হন করে হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ডামবার্টন বলল, "ভয় করছে, ও নিজে একা বাহাদুরি নেবার জন্য ফস করে না খবরের কাগজে কিছু বারটার করে বসে। এখনও কিছুই পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি, অথচ ও আমাদের টেক্কা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।"

আমি বললাম, "তাও তো জানে না যে গুহার ভিতরে আমরা খুট খুট শব্দ শুনেছি। তা হলে তো ও বলে বসত যে এখনও গুহার মধ্যে লোক বাস করছে—ছবিগুলো পঞ্চাশ হাজার নয়, পাঁচ বছর আগে আঁকা।"

আমরা রীতিমতো ক্লান্ত বোধ করছিলাম—তাই আর সময় নষ্ট না করে যে যার ঘরে চলে গেলাম। বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছে, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক। গরম জলে স্নান করে, পর পর দু কাপ কফি (এখানকার কফি ভারী চমৎকার) খেয়ে ক্রমে শরীর ও মনের জোর ফিরে এলো। ডিনারও ঘরেই আনিয়ে খেলাম। তারপর বসলাম আমার তোলা ছবিগুলো নিয়ে। উদ্দেশ্য হিজিবিজিগুলোর রহস্য উদঘাটন করা। অপরিচিত অক্ষরের মানে বার করতে আমার জুড়ি কমই আছে। হারাপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর লেখার মানে পৃথিবীতে আমিই

প্রথম বার করি।

দেড় ঘণ্টা ধরে হিজিবিজিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, যেটা তৎক্ষণাৎ ডামবার্টনকে ফোন করে জানালাম। চিহ্নগুলো সবই বৈজ্ঞানিক ফরমুলা, আর তার সঙ্গে আমাদের আধুনিক যুগের অনেক ফরমুলার মিল আছে।

ডামবার্টন পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ঘরে এসে আমার কথা শুনে ধপ করে খাটের উপর বসে পড়ে বলল, "দিস ইজ টু মাচ! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শ্যাঙ্কস। এ ফরমুলা পঞ্চাশ হাজার বছর আগের বনমানুষে বার করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

আমি বললাম, "তা হলে?"

"তা হলে আর কী! তা হলে ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হয়! আদিম মানুষ সম্বন্ধে আজ অবধি যা কিছু জানা গেছে, তার কোনওটাই এই অঙ্কের ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।"

পেদ্রোর মৃতদেহের কাছেই যে কাঁটার মতো জিনিসটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। ডামবার্টন অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে তুলে নিয়েছিল। হঠাৎ ও সেটা নাকের সামনে ধরে তার গন্ধ শুঁকতে লাগল।

"শ্যাঙ্কস!"

ডামবার্টনের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

"শুঁকে দেখো।"

আমি কাঁটাটা হাতে নিয়ে নাকে লাগাতেই একটা চেনা চেনা গন্ধ পেলাম। বললাম, "প্লাস্টিক।"

“ঠিক! কোনও সন্দেহ নেই। খুব চতুর কারিগরি—কিন্তু এটা মানুষের হাতেই তৈরি। এটার সঙ্গে কোনও জানোয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই।”

“কিন্তু এর মানে কী?”

প্রশ্নটা করা মাত্রই এর অনেকগুলো উত্তর এক ঝলকে আমার মনের মধ্যে খেলে গেল। বললাম, “ব্যাপার গুরুতর। প্রথম—পেদ্রো কোনও জানোয়ারের ভয়ে মরেনি। তাকে মানুষ মেরেছে। খুন করেছে। তার মানে একটাই হতে পারে—যে খুন করেছে সে চাইছে না যে আমরা গুহার কাছে যাই। আততায়ী যে কে, সেটা বোধ হয় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।”

“হুঁ!”

ডামবার্টন খাট থেকে উঠে পায়চারি শুরু করল। তারপর বলল, “আমাদের এখানে টিকতে দেবে মনে হয় না।”

“কিন্তু এইভাবে হার মানব?” আমার বৈজ্ঞানিক মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠেছিল।

ডামবার্টন বলল, “একটা কাজ করা যায়।”

“কী?”

“কর্ডোবাকে বলি, ক্রেডিট নেবার ব্যাপারে আমাদের কোনও লোভ নেই। আসলে যেটা দরকার, সেটা হলো এই আশ্চর্য গুহার তথ্যগুলো পৃথিবীর লোককে নির্ভুলভাবে জানানো। সুতরাং কর্ডোবা আমাদের সঙ্গে আসুক। আমরা একসঙ্গে অভিযান চালাই। তার অনুমান যদি ভুল হয়, তবু তার নামটা আমাদের সঙ্গেই জড়ানো থাকবে। লোকের চোখে আমরা হব একটা ‘টিম’। কী মনে হয়?”

“কিন্তু খুনিকে এইভাবে দলে টানবে?”

“খুনের প্রমাণ তো নেই। অথচ এটা না করলে সে আমাদের কাজে নানান্য বাধার সৃষ্টি করবে। আমাদের কাজ শেষ হোক। তারপর ওর মুখোশ খুলে দেওয়া যাবে। এখন কিছু বলব না। এমনকী, আমরা যে বুঝতে পেরেছি। কাঁটাটা প্লাস্টিকের, সেটাও বলব না। ওকে বুঝতে দেব আমরা ওর বন্ধু।”

“বেশ তাই ভালো।”

কর্ডোবাকে ফোন করে পাওয়া গেল না। এমনকী, তার বাড়ির লোকেও জানে না সে কোথায় গেছে। ঠিক করলাম কাল সকালে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমাদের এসব কাজ যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য যা কিছু করার দরকার করতে হবে।

ভয় হচ্ছে আকাশের অবস্থা দেখে। কালও যদি এমন থাকে তা হলে আর বেরোনো হবে না। তবে ছবি রয়েছে প্রায় আড়াইশো। সেগুলো ভালো করে দেখেই সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

২০শে আগস্ট

যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হলো। আজ সারাদিন হোটেলের ঘরে বসেই কাটাতে হলো। এখন রাত সাড়ে দশটা। এতক্ষণে বৃষ্টি একটু ধরেছে।

তবে ঘরে বসেও ঘটনার কোনও অভাব ঘটেনি। প্রথমত, আজও সারাদিন কর্ডোবার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অনেকবার টেলিফোন করা হয়েছে। ওর বাড়ির লোক দেখলাম বেশ চিন্তিত। পাগলামোর বশে বেরিয়ে গিয়ে ভূমিকম্পের ফলে রাস্তায় যে সব ফাটল হয়েছে, তার একটায় হয়তো পড়ে-টড়ে গেছে—এই তাদের আশঙ্কা।

এদিকে ডামবার্টনের মাথায় আরেকটা আশ্চর্য ধারণা জন্মেছে। দুপুরবেলা হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে বলল, "সর্বনাশ!"

আমি বললাম, 'আবার কী হলো?"

ডামবার্টন সোফাতে বসে বলল, "এটা তোমার মাথায় ঢুকেছে কি যে, দেয়ালের ওই সব সাংকেতিক ফরমুলাগুলো সব আসলে কর্ডোবার লেখা? ধরে যদি ছবির পাশে ওই হিজিবিজিগুলো লিখে সে প্রমাণ করতে চায় যে গুহাবাসী লোকেরা বিজ্ঞানে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল? এমন একটা জিনিস যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তা হলে তার খ্যাতিটা কেমন হবে তা বুঝতে পারছ?"

"সাবাস বলেছ!"

সত্যিই, ডামবার্টনের চিন্তাশক্তির তারিফ না করে পারলাম না। ডামবার্টন বলে চলল, "কী শয়তানি বুদ্ধি লোকটার ভাবতে পারো? আমি এখানে এসে পৌঁছোবার প্রায় দশদিন আগে গুহাটা আবিষ্কার হয়েছিল।

কর্ডোবা অনেক সময় পেয়েছে গুহাকে নিজের মতো করে সাজানোর জন্য। এইসব পাথরের যন্ত্রপাতি ও-ই তৈরি করিয়েছে—যেমন প্লাস্টিকের কাঁটাটা করিয়েছে।”

আমি বললাম, ‘ফরমুলাগুলোর পিছনে বোধ হয় মিথ্যাই সময় নষ্ট করলাম। কিন্তু—” আমার মনে হঠাৎ একটা খটকা লাগল— “গুহার ভিতরে খুট খুট শব্দটা কোত্থেকে আসছিল?”

“সেটাও যে কর্ডোবা নয় তা কী করে জানলে? ও যদি পেদ্রোকে খুন করে থাকে, তা হলে ও সেদিন গুহার আশেপাশেই ছিল। হয়তো গুহার আরেকটা মুখ আবিষ্কার করেছে। সেটা দিয়ে ঢুকে আমাদের ভয়-টয় দেখানোর জন্য শব্দটা করছিল।”

“কিন্তু এই সব করে ও অন্তত আমাকে হটাতে পারবে না।”

ডামবার্টন বলল, “আমাকেও না। কাল যদি বৃষ্টি থামে তা হলে আমরা আবার যাব।”

“আলবৎ! আমার অ্যানিস্থিয়াম বন্দুকের কথা তো আর ও জানে না।”

ডামবার্টন চলে গেলে পর বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কর্ডোবা যদি সত্যিই এতসব কাণ্ড করে থাকে, তা হলে বলতে হয় ওর মতো কূটবুদ্ধি শয়তান বৈজ্ঞানিক আর নেই। সত্যি বলতে কী, ওকে বৈজ্ঞানিক বলতে আর আমার ইচ্ছে করছে না।

কাল যদি গুহার আরও ভিতরে গিয়ে আর নতুন কিছু পাওয়া না যায়, তা হলে আর এখানে থেকে লাভ নেই। আমি দেশে ফিরে যাব। গিরিডিতে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আর আমার বেড়াল নিউটনের

জন্যেও মন কেমন করছে।

২২শে আগস্ট

মানুষের মনের ভাণ্ডারে যে কত কোটি কোটি স্মৃতি জমে থাকে, তার হিসাব কেউ কোনওদিন করতে পারেনি। আর কীভাবে ব্রেনের ঠিক কোনখানে সেগুলো জমা থাকে, তাও কেউ জানে না। শুধু এইটুকুই আমরা জানি যে, যেমনি বহুকালের পুরনো কথাও হঠাৎ হঠাৎ কারণে অকারণে আমাদের মনে পড়ে যায়, তেমনি আবার কোনও কোনও ঘটনা একেবারে চিরকালের মতো মন থেকে মুছে যায়। কিন্তু এক একটা ঘটনা থাকে যেগুলো কোনওদিনও ভোলা যায় না। একটু চুপ করে বসে থাকলেই দশ বছর পরেও এসব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার উপর সে ঘটনা যদি কালকের মতো সাংঘাতিক হয়, তা হলে সেটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে একটা শিহরন অনুভব করা যায়। আমি যে এখনও বেঁচে আছি সেটাই আশ্চর্য, আর কোন অদৃশ্য শক্তি যে আমাকে বার বার এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় তাও জানি না।

কাল ডায়রি লেখা হয়নি, তাই সকাল থেকেই শুরু করি।

বৃষ্টি পরশু মাঝরাত থেকেই থেমে গিয়েছিল। আমাদের জিপ তৈরি ছিল ঠিক সময়ে। আমি আর ডামবার্টন ভোর ছটায় হোটেল থেকে বেরোই। আমাদের জিপের ড্রাইভারের নাম মিগুয়েল, সেও জাতে স্প্যানিশ। গাড়ি রওনা হবার কিছু পরেই মিগুয়েল বলল, কর্ডোবার নাকি এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে সে হেঁটে বেরোয়নি, জিপ নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা প্রমাদ গুনলাম। তা হলে কি আবার সে গুহার দিকেই গেছে নাকি? গতকালই গেছে? এই বৃষ্টির মধ্যে?

সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। কর্ডোবার জিপ পাহাড়ের ফাটলের সামনে গুহার রাস্তার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে জিপটার উপর দিয়ে প্রচুর ঝড়ঝাপ্টা গেছে। ড্রাইভার বোধ হয় কর্ডোবার সঙ্গেই গেছে, কারণ গাড়ি খালি পড়ে আছে।

আমরা আর অপেক্ষা না করে রওনা দিলাম। মিগুয়েল বলল, "সিনিওর, আপনারা যাবেন, এটা আমার একদম ভালো লাগছে না। আমি যেতাম আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু সেদিন পেড্রোর যা হলো, তারপরে মনে বড় ভয় ঢুকেছে। আমার বাড়িতে বউ ছেলে রয়েছে।"

আমরা দুজনেই বললাম, "তোমার কোনও প্রয়োজন নেই; কোনও ভয়ও নেই। যদি বিপদের আশঙ্কা দেখ, তা হলে আমাদের জন্য অপেক্ষা না করে চলে যেও। তবে বিপদ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর দুষ্ট লোককে শায়েস্তা করার অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।"

গুহার মুখে পৌঁছে চারদিকে জনমানবের কোনও চিহ্ন দেখতে

পেলাম না। অন্যদিনের মতোই সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। জমিটা পাথুরে, আর জঙ্গলের দিকে ঢালু হয়ে গেছে বলে রাত্রের বৃষ্টির জল দাঁড়ায়নি এখানে। বৃষ্টি যে হয়েছে সেটা প্রায় বোঝাই যায় না।

কর্ডোবা কি তা হলে গুহার ভিতরেই রয়েছে, না জঙ্গলের দিকে গেছে?

ডামবার্টন বলল, "বাইরে অপেক্ষা করে কি কিছু লাভ আছে?"

আমি "না" বলে গুহার দিকে কয়েক পা এগোতেই, গুহার মুখের ডান পাশে বাইরের পাথরের গায়ে একটা ফাটলের ভিতর একটা সাদা জিনিস দেখতে পেলাম। এগিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখি সেটা একটা ভাঁজ করা চিঠি—কর্ডোবার লেখা। ভাঁজ খুলে দুজনে একসঙ্গে সেটা পড়লাম। তাতে লেখা আছে—

প্রিয় প্রোফেসর ডামবার্টন ও প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমরা আবার এখানে আসবে তা জানি। এ চিঠি তোমাদের হাতে পড়ামাত্রই বুঝবে আমার কোনও বিপদ হয়েছে, আমি গুহায় আটকা পড়েছি। সুতরাং তোমরা ঢোকার আগে কাজটা ঠিক করছ কি না সেটা একটু ভেবে নিও। আমি মরলেও, গুহার রহস্য ভেদ করেই মরব, কিন্তু লোকের কাছে সে রহস্যের সন্ধান দিতে পারব না। তোমরা যদি বেঁচে থাক, তা হলে এই গুহার কথা তোমরা প্রকাশ করতে পারবে। আমার একান্ত অনুরোধ যে তোমাদের সঙ্গে যেন আমার নামটাও জড়িয়ে থাকে।

পেদ্রোর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছ। কাঁটাটা আমারই ল্যাবরেটরিতে তৈরি। তবে জঙ্গলে পায়ের দাগ আমি সত্যিই দেখেছিলাম, সুতরাং ও ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত হলে সাংঘাতিক

ভুল করবে।

জানি, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা তো আর আমার মতো পাপী নাও।

ইতি—

পোরফিরিও কর্ডোবা

এই একটি চিঠিতে আমাদের মনের ভাব একেবারে বদলে গেল, আর নতুন করে একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা ভরে গেল। কিন্তু কাজ বন্ধ করলে চলবে না। বললাম, "চলো হিউগো, ভিতরে যাই। যা থাকে কপালে!"

কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারলাম এখানে কর্ডোবা এসেছিল, কারণ মাটিতে পড়ে আছে একটা আধখাওয়া কালো রঙের সিগারেট, যেমন সিগারেট একমাত্র কর্ডোবাকেই খেতে দেখেছি। কিন্তু এ ছাড়া মানুষের আর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। পাথরের উপর যখন পায়ের ছাপা পড়ে না, তখন আর কী চিহ্নই বা থাকবে?

সেই বিরাট হলঘরের ভিতর এসে, এবারে আর না থেমে সোজা বিপরীত দিকের সুড়ঙ্গ ধরে চলতে লাগলাম। সুড়ঙ্গ হলেও, এখানে রাস্তা বেশ চওড়া, মাথা হেঁট করে হাঁটতে হয় না।

একটা আওয়াজ কানে আসছে। একটা মৃদু গর্জনের মতো শব্দ। ডামবার্টনও শুনল সেটা। গর্জনের মধ্যে বাড়া কমার ব্যাপারও লক্ষ করলাম। আসল আওয়াজটা কত জোরে, বা সেটা কতদূর থেকে আসছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই। ডামবার্টন বলল, "গুহার ভিতর জানোয়ার-টানোয়ার নেই তো?" সত্যিই আওয়াজটা ভারী অদ্ভুত—একবার

উঠছে, একবার পড়ছে—অনেকটা গোঙানির মতো।

সামনে সুড়ঙ্গটা ডানদিকে বেঁকে গেছে। মোড়টা পেরোতেই দেখলাম আরেকটা বড় ঘরে এসে পড়েছি। টর্চের আলো এদিক ওদিক ফেলে বুঝলাম এ এক বিচিত্র ঘর, চারিদিকে অদ্ভুত অজানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা, আর দেওয়ালে ছবির বদলে কেবল অঙ্ক আর জ্যামিতিক নকশা আঁকা। যন্ত্রপাতিগুলোর কোনওটাই কাচ বা লোহা বা ইস্পাত বা আমাদের চেনা কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি নয়। এছাড়া রয়েছে সরু সরু লম্বা লম্বা তারের মতো জিনিস, যেগুলো দেওয়ালের গা বেয়ে উঠে এদিক ওদিক গেছে। সেগুলোও যে কীসের তৈরি সেটাও দেখে বোঝা গেল না।

মেঝেতে কিছু আছে কি না দেখবার জন্য টর্চের আলোটা নিচের দিকে নামাতেই একটা দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

দেওয়ালের কাছেই, তাঁর ডান হাত দিয়ে একটা তার আঁকড়ে ধরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন প্রোফেসর কর্ডোবা। কর্ডোবার পিঠে মাথা রেখে চিত হয়ে মুখ হাঁ করে পড়ে আছে তাঁর জিপের ড্রাইভার, আর ড্রাইভারের পায়ের কাছে ডান হাতে একটি বন্দুক আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে আরেকটি অচেনা লোক। তিনজনের কারুরই দেহে যে প্রাণ নেই সে কথা আর বলে দিতে হয় না!

আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো— "ইলেকট্রিক শক!" তারপর বললাম, "ওদের ছুঁয়ো না, ডামবার্টন।"

ডামবার্টন চাপা গলায় বলল, "সেটা বলাই বাহুল্য, তবে তাও ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ কর্ডোবাকে, কারণ ওর দশা না দেখলে আমরাও

হয়তো ওই তারে হাত দিয়ে ফেলতে পারতাম। কর্ডোবাকে বাঁচাতে গিয়েই অন্য দুজনেও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলো তো!"

আমি বললাম, "এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হচ্ছে—ফরমুলাগুলো কর্ডোবার লেখা নয়।"

সেই মৃদু গর্জনটা এখন আর মৃদু নয়। সেটা আসছে আমাদের বেশ কাছ থেকেই। আমি টর্চ হাতে এগিয়ে গেলাম, আমার পিছনে ডামবার্টন। গর্জনটা বেড়ে চলেছে।

যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাঁচিয়ে অতি সাবধানে মিনিটখানেক হাঁটার পর সামনে আরেকটা দরজা দেখতে পেলাম। এবং বুঝলাম যে সে দরজার পিছনে আরেকটি ঘর, এবং সে ঘরে একটি আলো রয়েছে। ডামবার্টনকে বললাম, "তোমার টর্চটা নেভাও তো।"

দুজনের আলো নেভাতেই একটা মৃদু লাল কম্পমান আলোয় গুহার ভিতরটা ভরে গেল। বুঝলাম ঘরটায় আগুন জ্বলছে, এবং গর্জনটাও ওই ঘর থেকেই আসছে। ডামবার্টনের গলা পেলাম—

"তোমার বন্দুকটা তৈরি রাখো।"

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে আমরা দুজনে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। প্রকাণ্ড ঘর। তার এক কোণে একটা চুল্লিতে আগুন জ্বলছে, তার সামনে কিছু জন্তুর হাড় পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের বেদি বা খাট, তাতে চিত হয়ে শুয়ে আছে একটি প্রাণী, ঘুমন্ত। গর্জনটা আসছে তার নাক থেকে।

আমরা নিঃশব্দে এক পা এক পা করে খাটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রাণীটিকে মানুষ বলতে বাধে। তার কপাল ঢালু, মাথার চুল নেমে এসেছে প্রায় ভুরু অবধি। তার ঠোঁট দুটো পুরু, থুতনি চাপা, কান দুটো চ্যাপ্টা আর ঘাড় নেই বললেই চলে। তার সর্বাঙ্গ ছাই রঙের লোমে ঢাকা। আর মুখের যেখানে লোম নেই, সেখানের চামড়া অবিশ্বাস্য রকম কুঁচকোনো। তার বাঁ হাতটা বুকের উপর আর অন্যটা খাটের উপর লম্বা করে রাখা। হাত এত লম্বা যে আঙুলের ডগা গিয়ে পৌঁছেছে হাঁটু অবধি।

ডামবার্টন অস্ফুটস্বরে বলল, "কেভম্যান! এখনও বাঁদরের অবস্থা থেকে পুরোপুরি মানুষে পৌঁছোয়নি।"

গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে আমি জবাব দিলাম, "কেভম্যান শুধু চেহারাতেই, কারণ আমার বিশ্বাস গুহার মধ্যে যা কিছু দেখছি সবই এরই কীর্তি।"

ডামবার্টন হঠাৎ কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "শ্যাঙ্কস—ওটা কী লেখা আছে পড়তে পারছ?"

ডামবার্টন দেয়ালের একটা অংশে আঙুল দেখাল। বড় বড় অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে। অক্ষরগুলো ফরমুলা থেকেই চিনে নিয়েছিলাম, সুতরাং লেখার মানে বার করতে সময় লাগল না। বললাম, "আশ্চর্য!"

"কী?"

"লিখেছে—'আর সবাই মরে গেছে। আমি আছি। আমি থাকব। আমি একা। আমি অনেক জানি। আরও জানব। জানার শেষ নেই। পাথর আমার বন্ধু। পাথর শত্রু!'"

ডামবার্টন বলল, "তা হলে বুঝতে পারছ—এই সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরই একজন—কোনও আশ্চর্য উপায়ে অফুরন্ত আয়ু পেয়ে গেছে।"

“হুঁ—আর হাজার হাজার বছর ধরে জ্ঞান সঞ্চয় করে চলেছে। কেবল চেহারাটা রয়ে গেছে সেই গুহাবাসী মানুষেরই মতন। ...কিন্তু শেষের দুটো কথার কী মানে বুঝলে?”

‘পাথর যে এর বন্ধু সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এর ঘরবাড়ি আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি সবই পাথরের তৈরি। কিন্তু শত্রু বলতে কী বুঝছে জানি না।”

আমারই মতো ডামবার্টনও বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, “গুহায় থাকে, তাই দিনরাত্রের তফাত সব সময়ে বুঝতে পারে না। হয়তো রাত্রে জেগে থাকে, তাই দিনে ঘুমোচ্ছে।”

ছবি তোলার সাহস হচ্ছিল না—যদি ক্যামেরার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়! আমাদের মতো মানুষকে হঠাৎ চোখের সামনে দেখলে কী করবে ও? কিন্তু লোভটা সামলানোও ভারী কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই ডামবার্টনের হাতে বন্দুকটা দিয়ে কাঁধের থলি থেকে ক্যামেরাটা বার করব বলে হাত ঢুকিয়েছি, এমন সময় নাক ডাকানোর শব্দ ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর ঘড়ঘড়ানির শব্দ পেলাম। ডামবার্টন খপ করে আমার হাতটা ধরে বলল, “আর্থকুয়েক!”

পরমুহূর্তেই একটা ভীষণ ঝাঁকুনিতে গুহার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কী যে করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

গুড়গুড় গুম গুম শব্দটা বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে ঝাঁকুনিও।

“বন্দুক!” ডামবার্টন চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

আদিম মানুষটার ঘুম ভেঙে সে খাটের উপর উঠে বসেছে।

আমি ডামবার্টনের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়েও কিছু করতে পারলাম না। কেবল তন্ময় হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকটা এখন উঠে দাঁড়িয়ে তার লোমশ ভুরুর তলায় কোটরে ঢোকা চোখদুটো দিয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে বুঝতে পারলাম সে লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। তার কাঁধটা গোরিলার মতো চওড়া, আর পিঠটা বয়সের দরুন বোধ হয় বেঁকে গেছে। তার চাহনি দেখে বুঝলাম সে আমাদের মতো প্রাণী এর আগে কখনও দেখেনি।

ভূমিকম্পের ঘন ঘন ঝাঁকুনির ফলে লোকটা যেন ভয় পেয়েছে। একটা কাতর অথচ কর্কশ আওয়াজ করে সে হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

একটা প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে বুঝলাম গুহার দেয়ালে কোথায় যেন ফাটল ধরল। আমরা আর অপেক্ষা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরমুহূর্তেই আদিম মানুষের ঘরের ছাতটা ধ্বসে পড়ে গেল।

কর্ডোবা আর তার সহচরদের মৃতদেহ পাশ কাটিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ডামবার্টন বলল, "শেষ কথাটার মানে বুঝলে তো? পাথর চাপা পড়েই ওকে মরতে হলো!"

ঝাঁকুনি থামছে না। কীভাবে আমরা বাইরে পৌঁছোব জানি, না। এখনও হামাগুড়ি দেওয়া বাকি আছে। বড় হলঘরটার কাছাকাছি এসে দেখি সামনে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। কীরকম হলো? পথ তো একটাই। ভুল পথে এসে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এগিয়ে গিয়ে দেখি ভূমিকম্পে ঘরের দেয়ালে বিরাট ফাটল হয়ে

বেরোবার একটা নতুন পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পাথর ভাঙার ফলে কিছু আশ্চর্য ছবি ও নকশা যে চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে গেল, সেটা আর ভাববার সময় ছিল না। গুহার নতুন মুখ দিয়ে দুজনে দৌড়ে ভাঙা পাথর ডিঙিয়ে বাইরে বেরোলাম।

বাইরে এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দিকভ্রম হয়েছিল, তারপর অ্যান্ডিজের চূড়োয় সাদা বরফ দেখে আবার হদিস পেয়ে গেলাম। আমাদের বাঁ দিক ধরে চলতে হবে—তা হলেই গুহার আসল মুখ ও আমাদের বেরোনোর রাস্তায় পৌঁছোতে পারব।

মাঝে প্রায় আধ মিনিটের জন্য ঝাঁকুনি থেমেছিল; আবার গুম গুম শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ডতর ঝাঁকুনি শুরু হলো।

কিন্তু ভূমিকম্পের শব্দ ছাড়াও যেন আরেকটা শব্দ পাচ্ছি। সেটা আসছে আমাদের ডানদিকের ওই ভয়ংকর জঙ্গল থেকে। শব্দটা শুনে মনে হয় যেন অসংখ্য দামামা একসঙ্গে বাজছে, আর তার সঙ্গে যেন অজস্র অজানা প্রাণী একসঙ্গে আতঙ্কে চিৎকার করছে।

জঙ্গলের দিকে চেয়ে থেমে পড়েছিলাম, কিন্তু ডামবার্টন আমার আস্তিন ধরে টান দিয়ে বলল, “থেমো না! এগিয়ে চলো!”

পথ খানিকটা সমতল হয়ে এসেছে বলে আমরা আমাদের দৌড়ের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ডানদিক থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিলাম না। কারণ সেই ধুপধুপানি আর তার সঙ্গে সেই ভয়াবহ আর্তনাদের শব্দ ক্রমশ বাড়ছিল, এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ দেখতে পেলাম জানোয়ারগুলোকে। জঙ্গল থেকে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে আসছে। হাজার হাজার জানোয়ার। প্রথম সারিতে

ম্যামথ—অতিকায়, লোমশ, প্রাগৈতিহাসিক হাতি। চিৎকার করতে করতে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে জঙ্গলের বাইরে খোলা জায়গায়—অর্থাৎ আমাদেরই দিকে।

এই অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমাদের দুজনেরই যেন আর পা সরল না। অথচ জানোয়ারগুলো এসে পড়েছে তিন-চারশো গজের মধ্যে।

হঠাৎ ডামবার্টন শুকনো গলায় চিৎকার করে বলে উঠল, "ওটা কী?"

আমিও দেখলাম—ম্যামথের ঠিক পিছনেই এক কিম্ভূত জানোয়ার—তার গলা লম্বা, নাকের উপর শিং আর পিঠের উপর কাঁটার ঝাড়। গুহার দেয়ালের ছবির জানোয়ার!—ল্যাজের উপর ভর দিয়ে ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে প্রাণের ভয়ে!

আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। হাতে আমার অ্যানিস্থিয়াম বন্দুক। কিন্তু এই উন্মত্ত পশুসেনার সামনে এ বন্দুক আর কী?

ডামবার্টনের পা কাঁপছিল। "দিস ইজ দি এন্ড"—বলে সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল।

আমি এক হ্যাঁচকা টানে ডামবার্টনকে মাটি থেকে উঠিয়ে বললাম, "পাগলের মতো কোরো না—এখনও সময় আছে পালানোর।"

মুখে বললেও, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ম্যামথের সার একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ভূমিকম্পের তেজ কিছুটা কমেছিল, এখন আবার প্রচণ্ড কাঁপানি শুরু হলো, আর তার সঙ্গে বাড়ল জন্তুদের চিৎকার। পিছনে বাইসনের দল দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে সে যে কী ভয়ংকর শব্দ তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

কিছুদূর দৌড়ে আর এগোতে পারলাম না। এ অবস্থায় বাঁচবার আশা পাগলামো ছাড়া আর কিছু না। তার চেয়ে বরং হাতির পায়ের তলায় পিষে যাবার আগে সেগুলোকে কাছ থেকে ভালো করে দেখে নিই। এমন সুযোগও এর আগে কোনও সভ্য মানুষের কখনও হয়নি!

ডামবার্টন আর আমি দুজনেই থেমে এগিয়ে আসা জানোয়ারের দলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। আর কতক্ষণ? খুব বেশি তো বিশ সেকেন্ড!

আবার নতুন করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হলো—আর তার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারদের মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য—যেন তারা হঠাৎ বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাবে—দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক করছে—পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে।

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তেমন দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি—ভবিষ্যতেও দেখব কি না জানি না। সামনের সারির ম্যামথগুলোর পায়ের তলার জমিটা জঙ্গলের সঙ্গে সমান্তরাল একটা লাইনে প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে চিরে দুভাগ হয়ে গেল। তার ফলে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হলো তাতে কমপক্ষে একশো হাতি, বাইসন আর সেই নাম-না-জানা জন্তু হাত পা ছুঁড়ে বিকট চিৎকার করতে করতে ভূগর্ভে তলিয়ে গেল। আর অন্য জানোয়ারগুলো এবার ছুটতে শুরু করল উল্টো দিকে—অর্থাৎ আবার সেই জঙ্গলের দিকে।

আর আমরা? এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পই শেষকালে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল।

*** *** ***

গুহার মুখটাতে এসে দেখলাম তার ভিতরে যাবার আর কোনও উপায় নেই। ছাত ধ্বসে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরে যা কিছু ছিল তা বোধ হয় চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল আমার তোলা ছবিগুলো।

ফাটলের বাইরে এসে দেখি মিগুয়েল পালায়নি, তবে ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গেছে। আমাদের দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর কী!

কোচাবাম্বা ফেরার পথে ডামবার্টনকে বললাম, "বুঝতে পারছি—আমরাও ঠিক বলিনি, কর্ডোবাও ঠিক বলেনি। গুহাটা আদিমই বটে—সেখানে আমাদের অনুমান ঠিক। কিন্তু তার কিছু ছবি যে সম্প্রতি আঁকা—সেটাও ঠিক। কাজেই সেখানে কর্ডোবা ভুল করেনি।"

ডামবার্টন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "পঞ্চাশ হাজার বছরের বুড়ো কেভম্যানের কথা লোকে বিশ্বাস করবে বলে মনে হয়?"

আমি হেসে বললাম, "যারা আমাদের পুরাণের সহস্রায়ু মুনি ঋষিদের কথা বিশ্বাস করে, তারা অন্তত নিশ্চয়ই করবে।"

সন্দেশ। ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৭৫, বৈশাখ ১৩৭৬